৪৮.৭ মহাকাব্য ঃ স্বরূপ ও বৈচিত্র্য

মধুসূদন দত্তের অন্যতম অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য'। 'মেঘনাদবধ' বাংলা সাহিত্যে প্রথম ও এ পর্যন্ত রচিত সফলতম কাব্যকৃতি। এই কাব্যের অনুসরণে পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি মহাকাব্য লেখা হলেও মধুসূদনের মহাকাব্য অর্জনকারী কবিপ্রতিভাকে আর কেউ অতিক্রম করতে পারেননি।

মধ্যযুগে রাজা বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষণায় সংস্কৃতি রচিত রামায়ণ মহাভারত কাব্যের অংশত বা সমগ্রত অনুবাদ হয়েছে। সেগুলি ছিল ভক্তিমূলক বা বীরত্বজ্ঞাপক কাহিনীর বঙ্গীয় সংস্করণ। বস্তুতঃ এগুলি সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শিল্প রূপ বা মৌলিক সৃষ্টি নয়। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' সাহিত্যিক মহাকাব্যের (Literary epic) আদর্শে সৃষ্ট। এটি থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার প্রবর্তনা ঘটেছে।

মহাকাব্যই বোধ হয় সাহিত্যের প্রাচীনতম ধারা। ইলিয়াড-ওডিসি, রামায়ণ-মহাভারত, বিউলক প্রভৃতি মহাকাব্যগুলি জাতীয় জীবনের সহস্ররূপকে তুলে ধরেছে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'এপিক (Epic) গ্রিক 'এপস' (Epos) শব্দ থেকে এসেছে। এখানে বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী থাকে, যে ভাষাতেই লেখা হোক, তা বিষয় ও ভাষায় মহত্বের ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। এ শ্রেণির রচনায় একটা বিশালতা, বিস্তৃতি, ঔদার্য ও সর্বজনীনতা থাকে। এই বিরাটত্ব ও বিস্তৃতি পাঠক হৃদয়ে এক মহিমান্বিত ভাবের সঞ্চার করে। মহাকাব্যে কবির ব্যক্তিগত প্রকাশের পরিবর্তে ব্যাপকতর সমাজ, গোষ্ঠী, জাতির ঐতিহ্য ও চিন্তাভাবনা পরিচয় পাওয়া যায়।

'পোয়েটিকস' রচয়িতা অ্যারিস্টোটল ট্র্যাজেডির পাশাপাশি মহাকাব্যেরও লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। এখানেও কাহিনীর আদি-মধ্য-অন্ত থাকে এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে নানা উপাখ্যান যুক্ত হতে পারে। এ শ্রেণির কাব্যের ছন্দ ও ভাষারীতি ওজোগুণ সম্পন্ন। এখানে উপমার ঐশ্বর্য কখনও কাহিনীর গতি অবরুদ্ধ করলেও আবেগের গভীরতা ও বিস্তৃতি ঘটায় কাব্যের উপস্থাপনায় বস্তু নিষ্ঠা যেমন তেমনি চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য কিছু অলৌকিকত্ব ও কাব্যসম্মতভাবে থাকতে পারে। এপিক শ্রেণির রচনায় দেবতা ও মানুষ একসঙ্গে সক্রিয় থাকে, এখানে নায়ক হন জাতীয় বীর। উদাহরণ হিসেবে মেঘনাদ বধ-এর পূর্বমুহূর্তে মেঘনাদ কর্তৃক লক্ষ্মণকে আক্রমণের বর্ণনায় এই পরিচয় পাওয়া যায়—

অধীন ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘন্টা, উপহার পাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিতা কোপে ;
যথা অভিমন্যু রক্ষী, নিরস্ত্র সমরে,
সপ্তরথি অস্ত্রবসে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি
ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে।
সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষণ পানে গর্জি ভীম নাদে,
প্রহারয়ে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী।

আলংকারিক বিশ্বনাথ 'সাহিত্য দর্পণে' মহাকাব্যের কতকগুলি লক্ষণের কথা বলেছেন, যেমন এতে অষ্টাধিক সর্গ থাকবে। প্রতিটি সর্গে যে কথা প্রাধান্য পাবে সেই কথা বা তাৎপর্য অনুসারে এটির নামককরণ হবে। বিভিন্ন সর্গ একই ছন্দে লেখা হবে। এ ছাড়া মহাকাব্যের নায়ক যিনি হবেন তিনি কোনো দেবতা বা সদ্বংশজাত ধীরোদাও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। রচনা অলঙ্কার এবং রসভাব-সম্বলিত হবে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের যে কোনো একটি মহাকাব্যের অঙ্গী বা প্রধান রস হবে অন্য রসগুলি মূল রসকে পুষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া আরও কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন আলংকারিকেরা। আলোচনায় সেগুলি বাহুল্য বিচারে উল্লেখ করা হল না।

সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন দেশে যে লোকগাথা কিংবদন্তি রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী নানাভাবে ও ভাষায় লোকজীবনে বহুল প্রচলিত ছিল, সেগুলি থেকে উপাদান নিয়ে জাতীয় জীবনের একটি সংহত রূপ নিয়ে মহাকাব্য প্রকাশিত হয়েছে। ইলিয়াড, ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারত এভাবেই গড়ে উঠেছে। এগুলিকে তাই স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্য (Epic of growth বা authentic epic) বলে। পরবর্তী যুগের সাহিত্যক মহাকাব্য (literary epic) সঙ্গে এই শ্রেণির কাব্যের সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচিত পার্থক্য আছে। প্রথমোক্তটির কবিকল্পনায় আদিম মানবসভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে। এ কাব্যের কবি কল্পনায় সরলতা ও প্রত্যক্ষতার পরিচয় থাকে। বিষয়বস্তু ও চরিত্র-পরিকল্পনায় গৌরব মহিমা (sublimity) এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই এর কাহিনীর কেন্দ্রে থাকে কোনো বীরত্ব উদ্দীপণাপূর্ণ যুদ্ধ এবং একজন বীরনায়ক এই কাহিনীর মেরুদণ্ডরূপে অবস্থান করেন। এর গঠনরীতি স্থাপত্যধর্মী হলেও ট্র্যাজেডির তুলনায় অসংহত, কিছুটা শিথিল। ঋজুতাহ এর কল্পনার বৈশিষ্ট্য।

সাহিত্যিক মহাকাব্য সচেতন শিল্পীর রচনা—এখানে তাঁর তীক্ষ্ণ ও সুনির্দিষ্ট দৃষ্টির প্রভাব অনুভব করা যায়। এখানেও নায়ক বীর, চরিত্রমহিমায় অনন্য। সে যুগের মানব মহিমার চূড়ান্ত প্রকাশ ছিল বিজয়ীর সম্মান ও জয়মাল্যে। ধর্ম, চরিত্র নীতি ও সমাজনীতির কাছে তার শৌর্যবীর্যের মান্যতা ছিল। তাই সাহিত্যিক মহাকাব্য কেবলমাত্র বীরকাব্য নয়—কিছু পরিমাণে জাতীয় কাব্য। ভার্জিন, মিল্টনের মতো মধুসূদনের কাব্যে মেঘনাদ ও রাবণের প্রতিরোধ-শক্তি এবং দেশরক্ষার ক্ষেত্রে তাদের আত্মমর্যাদা জ্ঞানের বলিষ্ঠ প্রকাশ যুগধর্মকেই প্রকাশ করেছে। মধুসূদন রামায়ণ কাহিনীর যে নির্বাচিত অংশকে কাব্যরূপ দিয়েছেন তাতে নবজাগ্রত মানবিকবোধ ও আত্মগরিমার যোগ আছে। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক সাধারণ বীর নয়, জাতীয় বীর। তাঁর বীরত্ব কেবল দেশবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি-সম্মান আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বৃহত্তর জাতীয় মঙ্গালাদর্শে ব্যয়িত হয়েছে। সাহিত্যিক মহাকাব্যের কবি, যেহেতু তাঁর যুগ পরিবেশের সৃষ্টি, যুগের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণার দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত, তাই তাঁর মহাকাব্যও সমসাময়িক যুগের সমাজ-মনের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রসঙ্গাত দেশি বিদেশি সাহিত্যিক মহাকাব্য কালিদাসের কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ; ভার্জিনের 'ইনিড', তাসসোর 'জেরজালেমের উদ্ধার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ব্যঙ্গা মহাকাব্য (Mock epic, mock heroic epic) শব্দটির সঙ্গে মহাকাব্য শব্দ যুক্ত থাকলেও এটি বস্তুত বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যের বিদ্রুপাত্মক অনুকরণ। অতিশয় তুচ্ছ বিষয় বস্তু নিয়ে এ ধরনের কাব্যে ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনায় গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশ থাকে। আলেকজাণ্ডার পোপের 'দি রেপ অফ দি লক' এক সময় হোমারের নামে চালিত একটি ছদ্ম মহাকাব্যের অনুসরণে রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভেক-মূষিক যুদ্ধ', জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' এই পর্যায়ভুক্ত। সাহিত্য হিসেবে এগুলির কোনো স্থায়ী মূল্য না থাকলেও সমকালীন পটভূমিকায় এর কিছু জনপ্রিয়তা থাকে।

মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃত্রসংহার (১৮৭৫) মহাকাব্য প্রকাশ করেন। মধুসূদনের বীরভাবপ্রধান কাব্যের মধ্যে অন্তর্গূঢ় করুণ রসের অন্তঃসলিল প্রবাহে কাব্যের বিষয়বস্তুকে হৃদয়বেদ্য করেছেন। ঘটনার ঘনঘটার সঙ্গে বীর রসপ্রধান যুদ্ধায়োজনের প্রেক্ষাপটে এই রসসৃষ্টি কাব্যশিল্পের প্রয়োজনে এসেছে। হেমচন্দ্র কাব্যের ঘটনাসংঘট্টের নীরসতা দূর করবার জন্য আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে রোমান্টিক সুরের অবতারনা করেছেন। ফলে লৌকিক প্রেমকাব্যের মূল গতি মহাকাব্যের প্রবাহের সঙ্গে অন্বিত হয়নি।

অপরদিকে মধুসূদনের কবিচিত্তের সহানুভূতিতে রাবণ-মেঘনাদ, লঙ্কা ও রাক্ষসকুল অভাবনীয় মহিমায় মহিমান্বিত হয়েছে। কিন্তু 'বৃত্রসংহার' কাব্যে কবির সহানুভূতি কোন্ দিকে তা সহজে বোঝা যায় না। কাব্যে বৃত্র ও অসুরকুল, ইন্দ্র ও দেবকুল প্রায় সমান গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু বৃত্র নিধন এ কাব্যের প্রধান বিষয়, কাব্যের সমাপ্তি তার পতনে—পতন চিত্রই কবির বর্ণনীয় বিষয়। বৃত্রের পতনে কাব্যে কোন ট্রাজিক রস সৃষ্টি হয়নি ; তার পতনে পাঠকের ভাবলোকে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। 'মেঘনাদবধ কাব্য' এদিক থেকে বৃত্রসংহারের তুলনায় সার্থকতর সৃষ্টি। মেঘনাদবধে রাবণের শোকক্লিষ্ট বিদীর্ণ হৃদয়, মন্দোদরীর শোকব্যাকুল চিত্ত ও সর্বোপরি লঙ্কার হাহাকার ট্র্যাজেডিকেই প্রকাশ করেছে।

নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী মহাকাব্য রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬)-এ শ্রীকৃষ্ণের জীবনব্রতের তিনটি পর্ব বর্ণিত হয়েছে। রৈবতকে সূত্রপাত, কুরুক্ষেত্রে জটিলতা ও বিস্তার প্রভাসে পরিণতি। কবি নীরস বর্ণনায় কাহিনী বিবৃত করেছেন। স্থানে স্থানে কাহিনী সূত্র ধরে রাখবার জন্য 'তত্ত্ব' নিয়ে এসেছেন, কখনও বা লঘু রোমান্টিক আখ্যানসূত্র। নবীনচন্দ্রের কাব্যের বিষয়বস্তু প্রায়শই প্রবন্ধের উপযোগী হয়েছে। একারণে তাঁর কৃষ্ণ চরিত্র পরিকল্পনায় কৃষ্ণের আদর্শ মতবাদকে চরিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, কৃষ্ণ চরিত্রকে গৌণ করে কাব্যে কৃষ্ণের আদর্শ প্রাধান্য ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। কবি তখনই সফল যখন তিনি কোন আদর্শকে চরিত্রের জীবনে ও ব্যক্তিত্বে সত্য করে ফুটিয়ে তোলেন। জীবনের সঙ্গে তত্ত্বের মিলন ঘটান। মধুসূদন পেরেছেন তাই সফল। নবীনচন্দ্র তা পারেননি।

৪৮.৮ মেঘনাদবধ কাব্য ঃ কাহিনী বিন্যাস (ষষ্ঠ সর্গ)

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আখ্যানভাগ রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক রাবণপুত্র মেঘনাদ নিধন এর বর্ণনীয় বিষয়। ষষ্ঠ সর্গের বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভর্ৎসনা, রামায়ণ থেকে নেওয়া মেঘনাদের মৃত্যুর পর বিভীষণের বিলাপ বাঙালির রামায়ণী সংস্কারের প্রভাবজাত। রাম এখানে অনেকটা আবেগপ্রবণ বাঙালি। চণ্ডীর বর ও দৈবাস্ত্র লাভ করে লক্ষ্মণ মেঘনাদ বধার্থে লঙ্কায় যাওয়ার প্রস্তাব করলে লক্ষ্মণের অমঙ্গল আশঙ্কায় রামচন্দ্র যখন বলেন "নাহি কাজ,—সীতায় উদ্ধারি। ফিরি যাই বনবাসে'।—তখন তাঁকে কৃত্তিবাসের প্রভাবে দুর্বলচিত্ত সাধারণ মানুষ রূপেই দেখি। সম্ভবত এ জন্যই মধুসূদন পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাবে রাবণ-ইন্দ্রিজিৎকে ভিন্নতর ধাতুতে গড়েছেন। শৈশব স্মৃতির রামায়ণ-মহাভারত তাকে টানত, ইলিয়াড-ওডিসির কাহিনী তাঁর কল্পনাকে উত্তেজিত করত। তাই মেঘনাদবধে রামায়ণের মহৎ ও স্নিগ্ধতার সঙ্গে ইলিয়াডের দীপ্ত শৌর্যের সমন্বয় ঘটিয়ে নতুনতর শিল্পসৃষ্টি করেছেন। মেঘনাদবধের কেন্দ্রীয় ঘটনা মেঘনাদের মৃত্যু। এটি কাব্যকাহিনীর শীর্ষ। প্রথম দুটি সর্গে কাব্যের চরিত্রগুলির বহুমুখী বিকাশ ও দেবতাদের ষড়যন্ত্র, আর এই সর্গ কাব্যের চরম মুহূর্তটিকে তুলে ধরেছে। ষষ্ঠ সর্গের কাহিনী বিশ্লেষণে তাই, প্রথম থেকে ষষ্ঠ সর্গ পর্যন্ত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া দরকার। কাব্যের শেষ তিনটি সর্গ ক্রমাবণতির মধ্য দিয়ে পরিণতিতে পৌঁছেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ঘটনাকালে তিনদিন দুই রাত্রিতে সীমাবদ্ধ। একে কবি নয়টি সর্গে বিভক্ত করে উপস্থিত করেছেন। প্রথম সর্গের সূচনা দূতমুখে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণের খেদ ও যুদ্ধের উদ্যোগ ঘোষণা এবং সংবাদ পেয়ে প্রমোদকানন থেকে মেঘনাদ রাজসভায় এসে স্বয়ং যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা, অনেক আশঙ্কা এবং একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেঘনাদকে সেনাপতি পদে অভিষেকে প্রথম সর্গের সমাপ্তি। দ্বিতীয় সর্গে দেব কাহিনী—মুখ্যত মেঘনাদের হত্যার ষড়যন্ত্রের পশ্চাৎপট। মূল ঘটনার সঙ্গে এর যোগ ঘনিষ্ঠ। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ। শুধু বীরের মৃত্যুতে হাহাকার তীব্রতা পায় না। পাঠকের চিত্তে সহানুভূতি জাগাতে পারে না। এখানে মেঘনাদ শুধু বীর নন, পিতামাতার স্নেহে, স্ত্রীর প্রেমে সম্পূর্ণ মানুষ। প্রমীলাল স্নিগ্ধ প্রেম ও তার বীরাঙ্গনা রূপ তাঁকে পূর্ণতা দিয়েছে। সমাগম নামে এই সর্গ এখানে তাই প্রাসঙ্গিক। চতুর্থ সর্গে সীতা-সরমা চরিত্রের উপস্থাপনা করে পরোক্ষভাবে রাবণ প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পঞ্চমসর্গ সবিশেষ ঘটনাবহুল। মেঘনাদ বধ-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। চিন্তান্বিত দেবরাজ, মায়াদেবীর উপস্থিতি, রক্ষকুলচূড়ামণিকে চূর্ণ করবার সংকল্প জ্ঞাপন, রাম লক্ষ্মণকে রক্ষার পরিকল্পনা, লক্ষ্মণের স্বপ্নদর্শন, চণ্ডীপূজার উদ্যোগ, শিবের বাধা দান, লক্ষ্মণের সাহসিকতা, মায়া সুন্দরীদের ছলনা, লক্ষ্মণের সিংহবাহিনী পূজা, রাক্ষসবধের বর প্রার্থনা, দৈবাস্ত্র লাভ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, জননী মন্দোদরীর আশীর্বাদ প্রার্থনা, যুদ্ধে পাঠাতে মায়ের আশঙ্কা, মেঘনাদের আশ্বাস, মেঘনাদের যজ্ঞশালা অভিমুখে যাত্রা, প্রমীলার পারর্বতীর কৃপা প্রার্থনা ও বায়ু বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইল তাহায়!

মেঘনাদবধের অন্যান্য সর্গের মতো পঞ্চম সর্গের অধিকাংশ ঘটনাই রামায়ণ-বহির্ভূত। কেবলমাত্র লক্ষ্মণ কর্তৃক চণ্ডীপূজা ও বরলাভ কৃত্তিবাস অনুসারী। বাকী অংশ পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাবে কল্পিত হলেও পাঠকের কাছে দেবতাদের ষড়যন্ত্র কতটা গভীর তা বোঝা যায়। তথাপি আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি কবি অসামান্য নৈপুণ্যে তুলে ধরেছেন স্বীকার করতে হয়। এই প্রেক্ষাপটে ষষ্ঠ সর্গের ঘটনাবর্ত ও কাব্যকাহিনী চরম মুহূর্তটিকে দেখতে হবে। প্রথম ও তৃতীয় সর্গে পিতা-পত্নী স্নেহ ও প্রেমের মাধুর্যে মেঘনাদ চরিত্র যেমন সহনীয় হয়ে উঠেছে তেমনি দ্বিতীয় ও পঞ্চম সর্গ দেব-মানবের যৌথ চেষ্টা ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের মৃত্যুকে অনিবার্য করে তুলেছে। স্বর্গে-মর্ত্যে এবং (পরে) পাতালে বা নরকে কাহিনীর বিস্তার তাকে এক ধরনের মহত্ত্ব দিয়েছে। চতুর্থ সর্গের সীতাহরণ প্রসঙ্গ মেঘনাদের মৃত্যু ও লঙ্কার ধ্বংসকে বাস্তবায়িত করার যুক্তি তৈরি করেছে। ষষ্ঠ সর্গের কাহিনীবৃত্ত ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মধুসূদন সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত যা বলেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার—কেবল ঘটনা নয় রচনার দিক থেকেও এ সর্গের সৌন্দর্য অতুলনীয়। এ সর্গের বর্ণনাভঙ্গির বড়ো বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে কবির দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। রামচন্দ্রের শিবির থেকে লক্ষ্মণ বিভীষণের লঙ্কাভিমুখে যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণ-বিভীষণের স্বার্থও প্রয়োজনবোধের বর্ণে চিত্রিত। তাদের ভীতি সংশয় আত্মবিশ্বাস ও দৈববিশ্বাসের সুরই মুখ্য। কিন্তু বিভীষণ-লক্ষ্মণের লঙ্কা প্রবেশের পূর্বমুহূর্ত থেকেই দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন হয়। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এ কাব্য লক্ষ্মণ বিভীষণকে বর্জন করে মেঘনাদের দৃষ্টিকে আশ্রয় করেছে। লক্ষ্মণ এখানে যে রূপে চিত্রিত হয়েছে, তা কবির দৃষ্টি-নিরপেক্ষ নয়। এ পরিবেশে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মেঘনাদের দৃষ্টিতে ঘৃণা, অবজ্ঞা, ক্রোধ-ধিক্কার উৎসারিত হয়েছে।

ষষ্ঠ সর্গের সূচনায় লক্ষ্মণের ইন্দ্রজিৎ নিধনের যাত্রার কথায় রামচন্দ্রের ভীতি বিহ্বল রূপ ফুটে উঠেছে। রাম সভয়ে বলেছেন, "নাহি কাজ মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি। ফিরি যাই বনবাসে। দুর্বার সমরে, দেব-দৈত্য-নরত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি।" ইন্দ্রজিতের সেই বীর্যবত্তা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুতে সমাহিত হবে। মেঘনাদের বীরত্বের বহু উল্লেখ কাব্যে থাকলেও তাঁর বীর্যবত্তার কোনো পরিচয় প্রত্যক্ষত কাব্যে তুলে ধরা হয়নি। সে যুদ্ধের অবকাশ পায়নি। তাই তার এই অপঘাত মৃত্যুকে নিয়তি নিয়ন্ত্রিত ট্র্যাজেডি বলা যায়। ষষ্ঠ সর্গ এভাবে একটি ট্র্যাজিক বেদনায় সমাপ্ত হয়েছে।

অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৬১ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন এবং প্রয়োজনে ৪৮.৮ ও ৪৮.৯ অংশের মূলপাঠ আবার পড়ুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) মধ্যযুগে _____ _____ পৃষ্ঠপোষণায় রচিত _____ _____ কাব্যের অংশত বা সমগ্রত হয়েছে।

খ) মহাকাব্যের উপস্থাপনায় _____ যেমন তেমনি _____ _____ জন্য কিছু _____ _____ ভাবে থাকতে পারে।

গ) সাহিত্যিক মহাকাব্য _____ _____ রচনা, এখানে তাঁর _____ ও _____ দৃষ্টির _____ অনুভব করা যায়।

ঘ) শৈশব স্মৃতির _____ _____ তাঁকে (মধুসূদন) টানত, _____ _____ কাহিনী তাঁর _____ উত্তেজিত করত। তাই মেঘনাদবধে রামায়য়ণের মহৎ ও _____ সঙ্গে _____ দীপ্ত _____ সমন্বয় ঘটিয়ে নতুনতর শিল্পসৃষ্টি করেছেন।

২) ক) 'স্বতঃস্ফূর্ত', 'সাহিত্যিক' ও 'ব্যঙ্গ' মহাকাব্যের দুটি করে উদাহরণ দিন।

খ) 'ত্রয়ী' মহাকাব্যের রচয়িতা কে ? কাব্যগুলির নাম উল্লেখ করুন।

গ) নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্যের শ্রীকৃষ্ণের জীবনব্রতের তিনটি পর্ব বর্ণিত হয়েছে। পর্ব তিনটি কী ?

৩) **সঠিক উত্তরের টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ**

ক) মেঘনাদবধ কাব্য—
১। বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ
২। কৃত্তিবাসের রামায়ণের অনুসরণে রচনা
৩। বাঙালির রামায়ণী সংস্কার অনুসরণে রচনা।

খ) বৃত্রসংহার কাব্যের রচনা কাল—
১। ১৮৬৫
২। ১৮৬১
৩। ১৮৭৫

গ) 'দি রেপ অব দি লক' রচনা করেন—
১। পোপ
২। হোমার
৩। ভার্জিল

ঘ) 'ভেক মূষিক যুদ্ধ'র রচয়িতা— ১। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২। হোমার

৩। রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪) অ্যারিস্টোটল মহাকাব্যের যে লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেগুলি উল্লেখ করুন।

৫) আলংকারিক বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে মহাকাব্যের কতগুলি লক্ষণের কথা বলেছেন। লক্ষণগুলি আপনার নিজের ভাষায় লিখুন।

৬) 'স্বাতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যে'র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৭) সাহিত্যিক মহাকাব্য সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৪৮.৯ মেঘনাদবধ কাব্য ঃ দেশি বিদেশি প্রভাব, রসবিচার, ট্র্যাজেডি ও নিয়তিবাদ

মধুসূদন তাঁর মহাকাব্য রচনার কাহিনী বাল্মীকী-কৃত্তিবাস থেকেই প্রধানত গ্রহণ করেছেন, তার সঙ্গে পাশ্চাত্য উপাদান সমন্বয়ে নূতন যুগের নূতন সৃষ্টি রূপে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশ। তাঁর রাম-লক্ষ্মণ, তাঁর মেঘনাদ-বিভীষণ, মায়া-লক্ষ্মীদেবী চরিত্র ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও যুগের অভিনব কল্পনার রঙে রঞ্জিত। ষষ্ঠ সর্হের বিষয় রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদ-নিধন। এই মূল ঘটনা উপস্থাপন করতে যে মহাকাব্য রচনা করেছেন, সেখানে হোমারের ইলিয়াড, দান্তের ডিভাইন কমেডি, মিলটনের প্যারাডাইস লষ্ট, বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের ভাবকল্পনা ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে।

মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ-নিধন তেমন তাৎপর্যমণ্ডিত না হলেও মেঘনাদ বধ কাব্যে এর গুরুত্ব সমধিক। কবি এটিকে কেন্দ্রীয় ঘটনা রূপে বিন্যস্ত করে ষষ্ঠ সর্গে ঘটনা প্রবাহের সন্ধিক্ষণ বা (climax) তৈরি করেছেন। বিভীষণ প্রদর্শিত পথে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মায়ার প্রভাবে অদৃশ্য থেকে লক্ষ্মণ প্রবেশ করে উষাকালে মেঘনাদকে নিহত করেছে। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই ঘটনা বিবৃত হয়েছে অন্যভাবে। সেখানে নিকুম্ভিলা কোনো যজ্ঞাগার নয়, নীল মেঘের মতো বটবৃক্ষতল, কৃত্তিবাস বলেছেন 'বটবৃক্ষতলা'—সেখানে লক্ষ্মণ নিক্ষিপ্ত ঐন্দ্রাস্ত্রে মেঘনাদের মৃত্যু এবং সময়টিও 'সূর্যাস্ত কাল'। রামায়ণে ইন্দ্রজিতের রাক্ষসীয় মায়া অবলম্বনের কথা থাকলেও, মেঘনাদবধ কাব্যে তার উল্লেখ নেই। এভাবে ষষ্ঠ সংর্গেও ভারতীয় উপাদনের কিছু পরিবর্তন ঘটালেও এখানে মেঘনাদ বিভীষণ সংলাপে বাল্মীকিকে প্রায় সম্পূর্ণ অনুসরণ করেছেন।

বাল্মীকি রামায়ণের লক্ষ্মণ মেঘনাদবধে অনেকটা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রামকে সে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে। সুমিত্রার নির্দেশ মতো রামকে পিতা সীতাকে জননী জ্ঞানে সেবা করেছে। রামের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় আত্মবিলোপ ঘটিয়েছে। শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণ রামের বিলাপে তাকে ভর্ৎসনা করেছে। লক্ষ্মণ চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যকে মধুসূদন কাজে লাগিয়েছেন। পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণ নৈতিক শক্তির বলে মায়াকাননের নানা প্রলোভন অনায়াসে অতিক্রম করেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো ছলনাময়ী বামাদলকে মাতৃ সম্বোধনে নিবৃত্ত করেছে। নুপূর অলংকৃত চরণের ঊর্ধ্বে সে কখনও তাকায়নি। কিন্তু এ হেন লক্ষ্মণ চরিত্র ষষ্ঠ সর্গে তাঁর উপরিউক্ত চরিত্রমহিমা বজায় রাখেনি। দেববলে বলীয়ান হয়ে সে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। বীরধর্ম লঙ্ঘন করে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'র মতো হীন উক্তি করেছে। বীরচরিত্রের আদর্শ বিরোধী এই আচরণ বোধ করি। রাবণ-

মেঘনাদের বীর্যের প্রতি আত্যন্তিক আগ্রহের কারণে মধুসূদন লক্ষ্মণকে তাঁর স্বভাব বিপরীত চরিত্ররূপে অঙ্কিত করেছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের দেবতারা মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকেন। তাদের চরিত্রের কোনো ক্রমবিকাশ নেই, পৃথক কোনো দেবীমহিমাও নেই। মানুষের মতো তাঁদের কামনা-বাসনা-লোভ-ঈর্ষা প্রভৃতি আছে। মানুষেরই মতো তাদের গতিবিধি ইচ্ছামতো কার্যসিদ্ধি—এ সবই ভারতীয় পুরাণানুসারী। এই দেবতারা প্রবঞ্চনা ছলনা করতে পরাঙ্মুখ নয়। তাই রাবণের একান্ত ভক্তি সত্ত্বেও রক্ষকুলের রাজলক্ষী বিশ্বাসঘাতকতা করে, ইন্দ্রজিতের কাছে পরাস্ত ইন্দ্র-ইন্দ্রজিদেতর সর্বনাশের উদ্যোগ নেয়। পার্বতী মোহিনী বেশে যোগী শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে। বলা হয় যে, রাবণ পাপী তাই দেবতারা তাকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু রাবণও মানুষ—সে পিতা, স্বামী, সে বীর। তাঁর হৃদয় মমত্বময়, বীরবাহুর মৃত্যুতে বিলাপ করে, মেঘনাদের মৃত্যুতে শোকাহত হয়। রাজা তাই শোক জয় করে রাজকর্তব্য পালনে কৃতসংকল্প হয়—এ সব মিলিয়ে মানবপ্রকৃতির পূর্ণ বিগ্রহ। মেঘনাদবধের দেবতারা এর কাছে হীন, তুচ্ছ। এভাবে চরিত্র-পরিকল্পনার পেছনে বাংলা মঙ্গাল দেবতার এবং পাশ্চাত্য মহাকাব্যের প্রভাব থাকাও একেবারে অসম্ভব নয়।

মেঘনাদবধের দেবতাদের আচরণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রিক ও লাতিন কাব্যের আদর্শে গড়া বলে মনে হয়। ইলিয়াডে যেমন দেবদেবীরা ছদ্মবেশে গিয়ে পরামর্শ দিয়েছে, মেঘনাদেও তার অনুসরণ দেখা যায়। মেঘনাদের শিবপার্বতী যেন গ্রিক দেবাতা জিউস-হেরা। গ্রিক-সাহিত্যের নিয়তি মেঘনাদবধকে অনেকটা প্রভাবিত করেছে। এতৎসত্ত্বেও বলা হায় মধুসূদনের দেবদেবী চরিত্র-চিত্রণে পাশ্চাত্য প্রভাব যদি থেকেও থাকে, তথাপি তাদের অচেনা বলে মনে হয় না। দেশীয় পুরাণে ও মঙ্গালকাব্যে এই ধরনের দেবদেবীর ভূমিকা আছে।

দণ্ডীর কাব্যাদর্শ অনুসারে মেঘনাদবধ কাব্যের রসবিচার করতে গেলে দেখা যাবে মধুসূদন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রসম্মত রীতিকে গ্রহণ করেও পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের অনুকরণে কিছু নূতনত্ব এনেছেন, আর এনেছেন কিছু গতিশীলতা। ফলত দুই আদর্শের মিলনে তাঁর কাব্য বিচিত্র রূপ ও রসে সঞ্জীবিত হয়েছে। মেঘনাদবধে বীররসের সঙ্গে করুণ রসের সম্মিলন ঘটেছে। বীররস এর স্থথায়ী রস হলেও সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে করুণরসের অন্তঃসলিলা ধারা নিয়ত প্রহমান। প্রথম সর্গেই সে পরিচয় আছে। দূতমুখে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে পিতার রাবণ হাহাকার করেছেন, তারপরই রাজা রাবণ—'স্তব্ধ হইল মনস্তাপে।' লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে কহিলা ; "সাবাসি দূত। তোর কথা শুনি/কোন বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে/সংগ্রামে ?" দীর্ঘ কান্নার পর আবেগকম্পিত হাহাকারই স্বাভাবিক কিন্তু সাবাসি দূত প্রভৃতি কথার কথার মধ্যে দিয়ে বীরত্বের যে উল্লাস ধ্বনিত হয়েছে, তা বিস্ময়কর। রসবিচারে একে বীররস বলতেই হয়। সুতরাং বেদনার হাহাকার আর বীরত্বে উল্লাস—করুণ আর বীরের দ্বৈতসত্তা কাব্যটির প্রথম সর্গে ধ্বনিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় বীর আর করুণের প্রতি কবির আকর্ষণ প্রবল। অন্যভাবে বলা যায়, বীরের আশ্রয়ে করুণ রস সৃষ্টি করে মধুসূদন কাব্য সৌন্দর্য বৃদ্ধির এক অভিনব ও সলার্থক পরীক্ষা করেছেন।

মেঘনাদবধ ধ্বংসোন্মুখ লঙ্কার চিত্র বিশেষ—রাবণ কেমন করে তিলে তিলে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে, কেমন করে নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁকে দুর্বল করছে, লঙ্কার ঐশ্বর্য গর্ব ধূলিসাৎ হচ্ছে সেটি বীরবাহুর মৃত্যুতে যার শুরু মেঘনাদের মৃত্যুতে তার শেষ। অর্থাৎ বিষাদে করুণে শুরু আর বিষাদে করুণেই শেষ। তাই বীররসের অন্তরালে নিগূঢ় করুণ রস প্রবাহিদত হওয়ায় রস দুটি পরস্পরের পরিপূরক হয়েছে। এক্ষেত্রে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির মহিমা উপলব্ধি সম্ভব নয়। বস্তুত মধুসূদন বারী-কাব্যই লিখেছেন। কিন্তু বীররসের অপর দিকেই আছে বেদনা। যুদ্ধে বীরত্ব এক পক্ষের মৃত্যুকে অবধারিত করে তোলে, মৃত্যুতে বীরত্ব আরও মহিমা পায়। সুতরাং করুণরস সম্পূর্ণ বর্জন করে যে বীররস, তার মহিমা তত উন্নত নয়।

মেঘনাদবধ কাব্যের ট্র্যাজিক রস পরিণতি সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু ট্রাজিডি রসসৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুটি কী বা কে এ নিয়ে প্রশ্ন আছে এবং এক্ষেত্রে ষষ্ঠ সর্গের ভূমিকা আলোচিত হতে পারে। এ বিচারের সূচনায় ট্রাজেডি সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করা দরকার।

গ্রিক ও ইউরোপের অন্যান্য ট্রাজেডির উদ্ভব, বিকাশ তার স্বরূপ ও রূপান্তর নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে। আমরা শুধু সংক্ষেপে বলতে পারি করুন কোনো কাহিনী, ঘটনার বর্ণনা ও তার রস পরিণতিই হোল ট্রাজেডি। তাই ট্রাজেডি করুণরসের আশ্রয়। মহৎ ও রাজকীয় কোনো ব্যক্তির শোকাবহ জীবনবৃত্ত বর্ণনা থেকে কালক্রমে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন-বিপর্যয় ট্র্যাজেডির বিষয় হয়েছে। মৃত্যুতেই ট্র্যাজেডি এ ধারণাও অপরিহার্য নয়। গ্রিক ইউরিপিদেশের রচিত মিলনান্ত ট্র্যাজেডিও আছে। কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় যখন নায়ক বা নায়িকার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, নিয়তির সঙ্গে অসম যুদ্ধে সে যখন বিধ্বস্ত, তার সেই বীরত্বপূর্ণ ও মর্মান্তিক আর্তির মধ্য দিয়ে পাঠক চিত্তে যে রসপরিণতি ঘটে তাকে ট্র্যাজেডি বলা যায়। অর্থাৎ প্রাণঘাতী পরিণতি নয়, মানবাত্মার মহিমাপূর্ণ অথচ নিরুপায় শোচনা ব্যক্তিহৃদয়ের দীর্ণ হাহাকারও ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করতে পারে।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান বিষয় মেঘনাদের মৃত্যু—ষষ্ঠ সর্গে তাঁর নিধন। একটি বীরের মহৎপ্রাণের বিনষ্টি। কাব্যটি এখানেই শেষ হয়নি। কারণ ট্র্যাজেডি যার মৃত্যু হয় তার নয়, যে বেঁচে থাকে তার। পরবর্তী তিনটি সর্গে এই ঘটনারই পরিণতি প্রলম্বিত হয়েছে। সপ্তম সর্গে মেঘনাদবধ-এর পর রাবণ মন্দোদরীর ও সমগ্র লঙ্কার হাহাকারের মধ্য দিয়ে মেঘনাদ নিধনোত্তর ভাবমণ্ডল নতুন মাত্রা পেয়েছে এই শোকের হাহাকারেই প্রমীলার চিতারোহন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রাবণের সর্বহারা চিত্তের যে সীমাহীন বেদনা, সমস্ত বিশ্বময় যে অনন্ত শূণ্যতাবোদের সঞ্চার করেছে, সেখানেই এ কাব্যের ট্র্যাজেডির রসপরিণতি ঘটেছে। তাই মেঘনাদবধ এখানে কেন্দ্রীয় ঘটনা হলেও, কেন্দ্রীয় ভাব রাবণের হৃদরে আর্তনাদ লঙ্কার আসন্ন সর্বনাশ তথা সর্বাত্মক ধ্বংসের আশঙ্কাজনিত বেদনা বোধ সঞ্চারিত হয়েছে। তাই মেঘনাদের যেখানে শেষ, সেখান থেকেই রাবণের জীবনের ট্র্যাজেডির সূচনা। মেঘনাদের মৃত্যু গভীর বেদনাবোধ থেকে করুণরস বা Pathos সৃষ্টি করে। একে একে বীরবাহু, কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর রাবণের একান্ত নির্ভর বীরপুত্র মেঘনাদের মৃত্যু ট্র্যাজেডির রস পরিণতি এনে দিয়েছে।

যেকোনো ট্র্যাজেডির মতোই নিয়তিবাদ—এ কাব্যের একটি উপাদান মনে করা হয়। প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের আক্ষেপ, বিধি, এ-ভব যার লীলাস্থলী তিনিই যাঁকে, 'বজ্র আঘাতে' যে কাতর তার বেদনা, অথবা চিত্রাঙ্গাদার অনুযোগের উত্তরে—'বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে', 'গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ? বিধিবশে দেবি, সহি এ যাতনা।' উত্তরে চিত্রাঙ্গাদা 'নিজ কর্মফলে মজালের লাক্ষসকুলে, মজিলা আপিন', রাজলক্ষীর উক্তি 'প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এপুরে।' ষষ্ঠ সর্গেও লক্ষীদেবী অনুরূপ উক্তি করেছেন, 'প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ? কৃতকর্মের ব্যাখ্যায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বিভীষণের উক্তি, 'নিজ-কর্ম-দোষে, হায় মজাইলা এ কনক লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি।'

গ্রীকপুরাণে নেমেসিস বা নিয়তি প্রতিহিংসার দেবী। আধুনিক সাহিত্যে দৈব, পরিবেশ, পরিস্থিতির প্রতিকূল মানবসত্তার অসহায় অবস্থাকে বোঝানো হয়। গ্রিক ধারণায় নিয়তি অপরিরোধ্য। যে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মানুষ নিয়ত সংগ্রাম করেও পরিণতিতে জয়ী হতে পারে না তাই নিয়তি। এ যেন মানুষের নিয়ন্ত্রণাতীত এক বিশ্ববিধান যেখানে মানুষ সাধারণ ক্রীড়ণকমাত্র।

মধুসূদনের রাবণের মতে তিনি নিয়তির দ্বারা আক্রান্ত। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি তাঁকে এই কঠোর দন্ড দিচ্ছে। যদিও চিত্রাঙ্গাদা, রাজলক্ষী এ মত পোষণ করেন না। তাঁরা রাবণের কৃতকর্মকেও দায়ী করেন। মেঘনাদ বধ-এর ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কায় প্রবেশ করার পর বিভীষণের চিত্ত দৌর্বল্য দেখা দিলে লক্ষণ বলেছে, 'চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে। এক যায় আর আসে জগতের রীতি'—এ উক্তির মধ্য দিয়ে যা ঘটতে যাচ্ছে তা যে বিধির বিধান এটি বুঝাতে চাওয়া হয়েছে। আবার তিনি মেঘনাদকে বলেছেন, দৈবাদেশে রণে আমি আহ্বানি তোরে।' লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধের পর বিভীষণের শোকে সান্ত্বনা দিতে 'বিধির বিধানে বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে তোমার'—প্রভৃতি সমস্ত কাজই যে বিধির বিধানে নিয়ন্ত্রিত তাই বোঝাতে চেয়েছেন। মধুসূদন মেঘনাদ চরিত্র সৃষ্টিতে কোনো ফাঁক রাখেননি। তাঁকে আদর্শ নায়ক করে গড়েছেন। সর্বোপরি মেঘনাদের মতো মহৎপ্রাণ, পিতৃভক্ত, প-ীপ্রেমী, দেশপ্রেমিক বীরের স্বীয় যজ্ঞাগারে এই নিতান্তই অপ্রত্যাশিত অন্যায়ভাবে নিহত হওয়াকেও অন্ধ নিয়তির নির্মমতা ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা করা যায় না। নিয়তি সৃষ্ট হয়েছে রাবণের 'পাপে' এবং তার প্রতিবিধানের জন্য রামের যুদ্ধযাত্রা ও দেবতাদের ষড়যন্ত্রে।

৪৮.১০ মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্র বিচার

ষষ্ঠ সর্গে রাম-রক্ষ্মণ, মেঘনাদ-বিভীষণ, লক্ষ্মী-মায়া প্রভৃতি চরিত্র কাব্য-বর্ণিত চরিত্রগুলির সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই সাদৃশ্যমূলক। মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গে প্রমীলার স্বীয় বংশগৌরব বীরত্বমহিমা প্রকাশ করেছে কিন্তু প্রতিপক্ষ রামচন্দ্রের প্রতি অনুচিত অবজ্ঞা "ভিখারী রাঘব" উক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। মধুসূদনও একটি চিঠিতে বলেছেন 'I hate Ram and his rabble.'। সমগ্র রামায়ণের যিনি নায়ক তাঁর চরিত্র কবি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আঁকতে পারেননি। মধুসূদনের রামচন্দ্র বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র নয়। বাল্মীকির রাম ধীর, স্থির, বীর, নির্ভীক বীর্যশালী পুরুষ। কৃত্তিবাসেও সে বীর, কিন্তু বাঙালির চরিত্র মহিমায় কিছুটা কোমল। এদিক থেকে মধুসূদনের সৃষ্টি দ্বন্দ্বসঙ্কুল এবং অনেকরটা বিপীতধর্মী। নবম সর্গে 'পুত্রের সৎক্রিয়া' সমাধার জন্য রাবণ মন্ত্রী সারণকে রামচন্দ্র সকাশে পাঠিয়েছেন সাতদিন সময় চেয়ে। রাবণ সে সময় প্রসঙ্গাত 'নরকুলোত্তম' রঘুকুলমণি যে বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবলে অতুল জগতে প্রভৃতি সম্ভ্রমাত্মক বিশেষণ প্রয়োগ করে সাতদিন সময় চেয়ে নেয়। রাবণ আরও বলে, কী কুক্ষণে রক্ষদলপতির সঙ্গে নরদলপতির রিপুভাবে দেখা হয়েছিল। এর উত্তরে রামচন্দ্রও ক্ষমাশীল বীরের ঔদার্য নিয়ে বলেছেন, তাঁর দুঃখে পরম দুঃখিত আমি রাহুগ্রাসে হেরি সূর্যে কার না বিদরে হৃদয়, বিপদে অপর পর সম মম কাছে' এ রামচন্দ্র মহৎ, ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল, যথার্থ বীর। কিন্তু তৃতীয় ও ষষ্ঠ সর্গে এই চরিত্রই সীমাহীন দুর্বলতার আকড়। তৃতীয় সর্গেও প্রমীলার দূতী রামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়ে লঙ্কায় যাওয়ার প্রসঙ্গা উল্লেখ করলে রামচন্দ্র বলেছেন, 'আর মম রক্ষঃপতি ; তোমারা সকলে কুলবালা, কুলবধূ, কোন্ অপরাধে বৈরি-ভাব আচরি তোমাদের সাথে ?' শেষে বলেছেন 'কি প্রসাদ, সুবদনে, দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্বাদ করি।' এক্ষেত্রে রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, তার মহত্ব, সস্নেহ আশীর্বাদ করার মধ্যে যে ঔদার্য তা বীর্যশালী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। মধুসূদনের সচেতন কল্পনা রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের এই মহৎ দিকটি দেখলেও, কবির নিজস্ব ভাব-দৃষ্টি তাঁকে অন্যপথে চালিত করেছে। তাই তৃতীয় সর্গেই বিভীষণকে বলেছেন 'দূতীর আকৃতি দেখি ডরিণু হৃদয়ে, রক্ষোবর যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি। মূঢ় যে ঘাঁটায়, হেন বাঘিনীরে। বা ষষ্ঠ সর্গে 'চলো ফিরি। পুনঃ মোরা যাই বনবাসে ; বা 'নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি। ফিরি যাই বনবাসে।" এই বীর্যহীন কান্নাও কবির রামচন্দ্র সম্পর্কে পূর্বকল্পিত 'ঘৃণা'র কারণেই বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে মায়াদেবীর সাহায্য নিয়ে যে নিন্দনীয় উপায়ে মেঘনাদকে বধ করা হয়েছে তা রামচন্দ্রের সপ্রশংস সমর্থন পেয়েছে। এ সমস্ত ঘটনাই রামায়ণ-বহির্ভূত। কবির কল্পনায়

রামচন্দ্রের যে দুর্বলচিত্ত একটি মানুষের ভাবমূর্তি আছে, এটি তারই প্রতিফলন। মধুসূদন মেঘনাদের প্রতি আত্যন্তিক মমত্ববশত, রামচন্দ্রকে কালিমালিপ্ত করেছেন। পরিবর্তে মেঘনাদকে বীরত্বে মহত্ত্বে মহতো মহীয়ান করে তুলেছেন।

রামায়ণের লক্ষ্মণ মূলত পুরুষকার-নির্ভর। মেঘনাদবধে দেব-দৈত্য-নরত্রাস অজেয় মেঘনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও সে বাল্মীকি রামায়ণের ছায়া মাত্র। তবে এ কাব্যে সে রামের থেকে সক্রিয়। রামচন্দ্রের মতো ভয়-ভীতি কান্নায় সে ভেঙে পড়ে না, অসম সাহসে ভর করে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার মতো বীর্যবত্তা ও শক্তি তাঁর আছে। রামচন্দ্র বিপন্ন বোধ করলে, সে তাঁকে সাহস দেয়। একা বনপথে লঙ্কায় চণ্ডীমন্দিরে যাওয়া লক্ষ্মণের পক্ষে অপরিমিত সাহস ও শৌর্য, রুদ্র ভৈরবকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে, দানবীয় শক্তিকে পরাস্ত করেছে। সর্বোপরি ভোগবিলাসে প্রলুব্ধ করতে মায়া-সুন্দরীদের চেষ্টাকে প্রতিহত করেছে। সমস্ত প্রলোভন ও কামনাজয়ী এই ব্রহ্মচারী তুলনাহীন। মধুসূদন এদিক থেকে লক্ষ্মণকে মেঘনাদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও, লক্ষ্মণের বীরত্ব বৈভব ম্লান হয়েছে, দৈবাস্ত্রে শক্তিশালী হয়ে মায়াদেবীর আনুকূল্যে চোরের মতো লঙ্কায় প্রবেশ করে নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা করায়। মেঘনাদ বলেছেন 'নিরস্ত্র যে অরি, নহে রথিকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।' লক্ষ্মণ উত্তরে বলেছেন 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। নিরস্ত্র মেঘনাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে, বীরধর্ম-বিরোধী এই আচরণ লক্ষ্মণকে কলঙ্কিত করেছে। তাঁর এতদিনের সমস্ত চরিত্র গৌরব মুহূর্তে ধূলিস্যাৎ হয়েছে। নিরস্ত্র প্রতিপক্ষকে অস্ত্রাঘাত করায় লক্ষ্মণ মনুষ্যধর্মের অবমাননা করেছেন। বস্তুত লক্ষ্মণের জয়ে মেঘনাদের বীর-গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

মেঘনাদ রক্ষকুলগৌবপ—মধুসূদন-এর—Favourite Indrajit 'বধ' নামক কাব্যের বধ্য ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ। তিনি এ কাব্যের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র। বাল্মীকি রামায়ণেও তিনি অসাধারণ বীর্যবান পুরুষ। সেখানে তাঁর দাম্পত্যজীবনের কোনো ছবি নেই। মধুসূদন তাঁর নায়কের চরিত্রে মানবিক বিস্তারের প্রয়োজনেই এদিকটির প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। মধুসূদনের মেঘনাদ প্রেমিক, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত, মাতৃপিতৃভক্ত কর্তব্যপরায়ণ বীর। তিনি 'লঙ্কার পঙ্কজ-রবি', রাক্ষস কুল-ভরসা'। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে কবির প্রিয়তম নায়কের মৃত্যু ঘটেছে। ইন্দ্রজিৎ তখন, 'পুজে ইষ্টদেবে নিভৃতে', কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরীয়, চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।' এই পবিত্র ভূমিকে হীন চক্রান্তের মাধ্যমে লক্ষ্মণ বধ্যভূমিতে রূপান্তরিত করেছেন। এত দ্বারা ইন্দ্রজিতের ধর্ম পরায়ণতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি লক্ষ্মণকে আতিথেয় সেবা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বীর সাজে সেজে আসার অনুমতি চেয়েছেন। এতে তাঁর রণ নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদকে আক্রমণে উদ্যত হলে, তিনি কোষার আঘাতে তাঁকে মূর্ছিত করেন। অস্তসূর্যের শেষ দীপ্তি এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। পরিশেষে লক্ষ্মণের অস্ত্রাঘাতে বীরের দেহ হয়েছে ক্ষতবিক্ষত—লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে। মেঘনাদ চরিত্র সৃষ্টিতে স্রষ্টার মধ্যে মেঘনাদের প্রতি একান্ত ভালোবাসার সঙ্গে শিল্পীর গভীর সংযমের অসামান্য মেলবন্ধন ঘটেছে।

অমিতবল মেঘনাদের মৃত্যু ও রক্ষোবংশের পরাভবের মূলে রাবণানুজ বিভীষণ। রামায়ণের বিভীষণ পুণ্যাত্মা। এখানেও সে ধর্মভীরু। পাপী ভাইয়ের পক্ষ ত্যাগ করে সে বনজীবনের দুঃসহ কষ্টকে স্বীকার করেছে। ধার্মিকতার কারণেই আত্মীয় বন্ধুদের বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেনি। উনিশ শতকীয় স্বাদেশিকতার দৃষ্টিতে আক্রান্ত দেশকে ত্যাগ করে আক্রমণকারীর সহায়তা করা বিশ্বাসঘাতকের দেশদ্রোহিতা বই কি? মেঘনাদ একারণেই বিভীষণকে নিন্দাবাদ করেছেন।

মধুসূদনের বিভীষণ শুধু দেশদ্রোহী নয়, সে শুধু 'জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি' কে বিসর্জনই দেয়নি, রাবণের কর্মফল ইত্যাদি বলে নিজের পুণ্যাত্মারূপটি তুলে ধরে হীন উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টাও করেছে। নিদারুণ সিংহাসন লোলুপতা তাঁর অন্তরে সুপ্ত ছিল। তার অন্তরবাসনাই স্বপ্নে রূপ পেয়েছে। রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী যেন দেখা দিয়ে বলেছে—"পাইবি শূন্য রাজসিংহাসন, ছত্র দন্ড সহ তুই"। এর থেকে বোঝা যায়, বিভীষণের যতই ধার্মিকতা থাকুক রামচন্দ্রের মিত্র বলে পরিচিত হয়েও, তার অন্তরে নিহিত ছিল রাজসিংহাসনের কামনা। সংস্কৃত রামায়ণে এর স্পষ্ট উল্লেখ না থারলেও, বালীর উক্তিতে এর আভাস আছে। মধুসূদন একেই তাঁর কাব্যে স্পষ্টতর করেছেন।

এতৎসসত্ত্বেও বিভীষণ চরিত্রের আরেকটি দিকও স্মরণ রাখতে হবে। বিভীষণেরও যে হৃদয় ছিল, মমত্ববোধ ছিল—তার প্রমাণ পাওয়া যায় মেঘনাদের মৃত্যুর পর বিভীষণের বিলাপে। বিভীষণের এই বিলাপ, তার স্নেহসিক্ত হৃদয়ের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। স্বার্থক্লিষ্ট দেশদ্রোহী একটি ব্যক্তির হৃদয়েও যে অন্তঃসলিল স্নেহের প্রস্রবণ থাকে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিলাপধ্বনি তার মানবিক ভিত্তিকেই বিশ্বাসযোগ্য করেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যে দেবদেবীর ভূমিকাও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যের কাহিনী নিয়ন্ত্রণে এঁদের অসামান্য অবদান আছে। রাবণ মেঘনাদের ভাগ্য এঁদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ষষ্ঠ সর্গে স্বর্গের লক্ষী ও মায়ার ভূমিকা নিরপেক্ষ দ্রষ্টার নয়। প্রধানতঃ এরাই সক্রিয় কুশীলবের মত মেঘনাদবধ কাব্য সম্পন্ন করিয়েছে।

লক্ষ্মী একদা সমুদ্রতলে নির্বাসিতা ছিলেন। মধুসূদন কল্পিত এই দেবী সাগরমন্থনের পর স্বর্গে ফিরে যেতে পারেননি। রাবণের ভক্তিতে লঙ্কায় ঐশ্বর্যলক্ষী হয়ে বিরাজ করছেন। রাবণ বীর্যের দ্বারা ধনসম্পদ অর্জন করায় লক্ষ্মী সেখানে ধরা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি স্বর্গে বিষ্ণুবক্ষে ত্বারায় ফিরে যেতে চান, তাই রাবণের পতন না ঘটলে যেতে পারছেন না। বীরবাহুর পতনের পর তিন 'প্রভাসা'র ছদ্মবেশে প্রমোদ উদ্যানে সংবাদ দিয়ে মেঘনাদকে লঙ্কায় নিয়ে এসে সৈনাপত্যে বরণ করান। ইনি আবার বলেন 'চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী/বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি/প্রমদা-কুল-রোদন। প্রতি গৃহে কাঁদে/পুত্রহীনা মাতা, পতিহীনা সতী।' (নবম সর্গ)। রাবণের দুষ্কৃতির জন্য তিনি তাঁর প্রতি বিরূপ, তাই রাবণ নিধনে উদ্যোগী। তিনিই দেবরাজ ইন্দ্রকে মেঘনাদের সৈনাপত্য গ্রহণের সংবাদ জানিয়ে, তার বধের উপায় জানবার জন্য ইন্দ্র দম্পতিকে পার্বতীর কাছে পাঠিয়েছেন। ইন্দ্রকে বলেছেন, না হইলে নির্মূল সমূহে/রক্ষপতি ভব রসাতলে যাবে।'—এ আগ্রহাতিশয্য শুধুই দুষ্কৃতিবিনাশ হেতু নয়, এর পেছনে বৈকুণ্ঠে ফিরে প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষায়ও। লক্ষীর এই স্ববিরোধী আচরণ তাই শুধু কৃতি-দুষ্কৃতি নয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টও বটে।

বধকাব্যের দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রভৃতি সর্গে মায়াদেবীর কথা আছে। তিনি মোহিনী বা মায়াজাল বিস্তার করে প্রতিপক্ষের কাছে অনেক ঘটনা আড়াল করেছেন। রামচন্দ্র ষষ্ঠ সর্গে দেবী মহামায়া অম্বিকার কাছে লক্ষ্মণকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছেন। দেবী মহামায়ার আদেশে মায়াদেবী মেঘনাদবধ-এর সহায়িকা শক্তিরূপে কাজ করেছেন। মায়ার আনুকূল্যে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ লঙ্কায় প্রবেশ করেছে। মায়ার ছলনায় ইন্দ্রজিতের সমস্ত দৈবাস্ত্র ব্যর্থ হলে কোষাঘাতে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছা গেছে। মায়াদেবীরই যে- পরে তার চেতনা সঞ্চার হয়েছে। তাই বলা যায় মেঘনাদবধে মায়াদেবী সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। দেবতাগণ রাবণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মায়ার সাহায্যে দৈবাস্ত্র দেওয়া থেকে সমস্ত সফল আয়োজন শেষে মেঘনাদকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিধন সম্পন্ন করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী থেকে বেশ বোঝা যায় মানুষ ও দেবতা এখানে একাকার হয়ে গেছে। তাঁদের মানুষের মতো কামনা-বাসনা-ঈর্ষা-ক্রোধ আছে কিন্তু মানবচরিত্রের মতো তাদের কোনো ক্রমবিকাশ নেই। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে-কোনো কাজই তাদের পক্ষে সম্ভব। তাদের কেউ মানবচরিত্রের মহত্ত্বও পায়নি।

অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৬১ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। প্রয়োজনে মূলপাঠ ৪৮.১১ এবং ২৮.১২ আরেকবার পড়ুন।

১) **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক) মূল রামায়ণে _____ _____ তেমন _____ না হলেও _____ এর গুরুত্ব সমধিক।

খ) নিকুম্ভিলা কোনো _____ নয়, নীল মেঘের মতো _____, _____ বলেছেন 'বটবৃক্ষতলা' যেখানে লক্ষ্মণ নিক্ষিপ্ত _____ মেঘনাদের মৃত্যু।

গ) মধুসূদন _____ অলংকারশাস্ত্র-সম্মত রীতিকে গ্রহণ করেও _____ কাব্য সাহিত্যের _____ কিছু নূতনত্ব এনেছেন, আর এনেছেন কিছু _____।

ঘ) মেঘনাদবধে _____ রসের সঙ্গে _____ রসের _____ ঘটেছে।

ঙ) দূতমুখে _____ মৃত্যু সংবাদ শুনে _____ _____ হাহাকার করেছেন, তারপরই _____ _____ 'স্তব্ধ হইল _____।'

২) **সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

ক) লক্ষ্মণ চরিত্র পরিকল্পনায়—
- ১। বাল্মীকির প্রভাব আছে
- ২। কৃত্তিবাসের প্রভাব আছে
- ৩।পাশ্চাত্য প্রভাব আছে

খ) মেঘনাদবধ কাব্য লঙ্কার—
- ১। ঐশ্বর্যের চিত্র বিশেষ
- ২। ধ্বংসোন্মুখ চিত্র বিশেষ
- ৩।যুদ্ধ চিত্র বিশেষ।

গ) মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ কাব্য—
- ১। বীরাঙ্গনা
- ২। মেঘনাদবধ
- ৩।চর্তুদশপদী কবিতাবলী

ঘ) ষষ্ঠ সর্গের কেন্দ্রীয় চরিত্র—
- ১। রাবণ
- ২। মেঘনাদ
- ৩।লক্ষ্মণ

৩) মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের কাহিনীবিন্যাসে মৌলিকতা সম্পর্কে ৫০ শব্দের মধ্যে আলোচনা করুন।

৪) ষষ্ঠ সর্গের পাশ্চাত্য প্রভাবিত অংশগুলির পরিচয় দিন।

৫) ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত মেঘনাদের শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিন।

৬) লক্ষ্মী ও মায়াদেবী ষষ্ঠ সর্গের মূল চালিকাশক্তি।—এ সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।

৭) লক্ষ্মণ চরিত্র পরিকল্পনায় বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণ কতটুকু, আলোচনা করুন।

৪৮.১১ মেঘনাদবধ কাব্য (ষষ্ঠ সর্গ) ঃ ভাষা, ছন্দ, অলংকার

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলংকারিকরা মহাকাব্যের ভাব-রসের সঙ্গে তার ভাষা-ছন্দ-অলংকার নিয়েও ভেবেছেন। এর বিষয়বস্তু, চরিত্র কল্পনা, ভাব ও রস সমস্তই গুরুগম্ভীর। তাই মহাকাব্যের ওজস্বিতা, বিশালতা ও বিস্তৃতি। ফলে মহাকাব্যের কল্পনায় একটি অসামান্য সমুন্নতি, ভাষায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকে—সেখানে প্রাধান্য পায় ওজোগুণ। অ্যারিস্টোটল মহাকাব্যের ভাব ও বাষায় ঐশ্বর্য ও রাসকিগুণ বিশিষ্ট ড্যাকটিলিক 'হেক্সামিটার' বা এ জাতীয় ছন্দ ব্যবহার সমর্থন করেছেন। বিশ্বনাথ গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণার সঙ্গে একই প্রকারের গাম্ভীর্যপূর্ণ ছন্দ ব্যবহারের কথা বলেছেন, কেবল সর্গের শেষে অন্য পদ্যছন্দ অনুমোদন করেছেন।

যেহেতু ভাষা ভাবের বাহন, কবি ভাষার আশ্রয়েই ভাবকে প্রকাশ করেন। আলংকারিকরাও বলেছেন, ভাবের সঙ্গে ভাষার পার্বতীপরমেশ্বর সম্পর্ক। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষায় ও বর্ণনায় মহাকাব্যোচিত ওজস্বিতা, গাম্ভীর্য ও বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এর ভাষা সম্পদ যে কোনো পাঠকের কাছে বিস্ময়ের স্থল। স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের কবির মতো মধুসূদনও তাঁর কাব্য সৃষ্ট চরিত্রের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। যেমন লক্ষ্মণ—সতীসুমিত্রাপুত্র, সৌমিত্রি কেশরী, রামানুজ, রামবানুজ, সৌমিত্রি ভীমবাহু লক্ষ্মণ। রামচন্দ্র—সীতানাথ রাঘব, রাঘবেন্দ্র, রঘুবর, রঘুকুলমণি, বৈদেহীপতি, বৈদেহীনাথ, দেবকুলপ্রিয়, দশরথাত্মজ। মেঘনাদ—রাবণি, দশাননাত্মজ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি। এভাবে বিশেষণ ঋদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে মধুসূদন বর্ণনায় সমৃদ্ধি এনেছেন। আবার শব্দ নির্বাচনেও তিনি বর্ণনায় ওজস্বিতার প্রয়োজনে গুরুগম্ভীর ও অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত কাব্যে সন্ধিসমান বহুল ভাষা ব্যবহার করে যে ওজোগুণ নিয়ে আসা হত, একালে সেটি অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় মধুসূদন তাকে যথাসম্ভব বর্জন করেছেন, পরিবর্তে ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টির জন্য যুক্তব্যঞ্জন ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে'। কিংবা 'উড়িল কলম্বকুল মলম্বা আকাশে।' এ ধরণের শ্বদ ব্যবহারে তাঁর প্রতিভার মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আরও একদিক থেকে মেঘনাদবধের ভাষা উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্র যেমন একদা তৎসম শব্দের সঙ্গে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করে ভাষায় গতি সঞ্চার করেছিলেন, মধুসূদন, তৎসম শব্দের সঙ্গে 'দাপিছে, 'নির্বীরিবে', 'আশ্বাসলি' প্রভৃতি নামধাতু এবং লোকায়ত শব্দ (যথা, 'জাভাল ভাঙি) ব্যবহার করে সেই গতি এনেছেন। এদিক থেকে মেঘনাদবধের ভাষা কিছু ত্রুটি যথা গুরুচন্ডালি (ঝড়াকারে' 'ফুলদল দিয়া')। ব্যাকরণে দুষ্ট (শিরোপরি, 'প্রফুল্লিত', গায়কী) শব্দ ব্যবহার সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।

মধুসূদন বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। বীররসপ্রধান কাব্যভাষার প্রয়োজনে ইংরেজি Biank Verse-এর ছন্দোরীতি বাংলার চতুর্দশ মাত্রার পয়ারের (মিশ্রবৃত্তের) কাঠামোয় পুরে মিলহীন প্রবাহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেন। যেহেতু কবিতায় ভাবের গুরুত্ব বেশি, তাই মধুসূদন ছন্দের বন্ধনদশা ঘোচাতে পঙক্তি অন্তে যতি পাত থেকে ভাবকে মুক্তি দিলেন। বন্ধনদশা থেকে মুক্ত এই ভাবরাশি স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হবার সুযোগ পেল। অর্থাৎ পঙক্তি শেষে ছেদ আর আবশ্যিক রইল না—পঙ্‌ক্তি থেকে পঙ্‌ক্তি ক্রমে আপন বেগে চলতে সক্ষম হল, যেখানে প্রয়োজন সেখানে থামবার সুযোগ হল। এর ফলে আট ও ছয় মাত্রার পর নিয়মিত যতি পড়ায় যে একঘেয়েমি তৈরি হয়েছিল তা আর রইল না। নানা ছত্রে, নানা জায়গায় যতি পাতের ফলে কাব্যের গতিতে বৈচিত্র্য এল। বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য মহাকাব্যের পক্ষে উপযোগী। ভাবের এই যে সচ্ছন্দ প্রবহমানতা এটিই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—মধুসূদন প্রবর্তিত পঙ্‌ক্তির অন্তে মিল হীনতা বা অমিত্র অক্ষরত্বই অমিত্রাক্ষর ছন্দে একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। প্রবোধচন্দ্র সেন একে অমিত্রাক্ষর ছন্দ না বলে প্রবহমান ছন্দ বলেন। পয়ারের যেমন দুটি ভেদ ৮ ও ৬ মাত্রার পয়ার এবং ১০ ও ৮ মাত্রার, মহাপয়ার প্রবহমান ছন্দের দুটি প্রধান ভাগ। প্রবহমান চতুর্দশমাত্রিক ও প্রবহমান অষ্টাদশমাত্রিক ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ এই দুই বৈশিষ্ট্যযুক্ত কবিতায় মিল যুক্ত করে সমিল প্রবহমান বা জটিল প্রবহমান পয়ার রচনা করেছেন। যেমন—মধূসূদন রচিত অমিল প্রবহমান পয়ার ঃ

প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল।
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে।
মূর্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে। (ষষ্ঠ সর্গ, মেঘনাদবধ কাব্য)

রবীন্দ্রনাথ রচিত সমিল প্রবহমান পয়ার ঃ

কবিবর কবে কোন্ বিস্তৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে। (মেঘদূত, মানসী)।

প্রাচ্য আলংকারিক আচার্য বামনের মতে কাব্যের গ্রহণ যোগ্যতা তার অলংকার প্রয়োগে। অলংকারেই কাব্যের সৌন্দর্য। আচার্য দণ্ডী ও কাব্যের শোভাকর ধর্মকেই অলংকার বলেছেন। এই অলংকার শব্দটি দুটি অর্থে ব্যঞ্জিত হয়েছে—১) অলংকার কাব্যদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, ২) অলংকার কাব্যদহের অর্থ সামর্থ্য বাড়ায়। এ থেকে বোঝা যায় অলংকার কাব্য দেহের ও ভাবের সৌন্দর্য বিধায়ক। কাব্য দেহ ভাবনা থেকে শব্দ নির্ভর ও 'ভাব' থেকে অর্থনির্ভর অলংকার অর্থাৎ শব্দালংকার (অর্থাৎ ধ্বনির অলংকার) ও অর্থালংকারের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। উভয়েরই লক্ষ্য কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি। মেঘনাদবধে এর ব্যাপক ব্যবহার আছে। প্রসঙ্গতঃ ষষ্ঠ সর্গে কয়েকটি শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যায়।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রাচ্য আধারে, পাশ্চাত্যে আদর্শে পরিকল্পিত সাহিত্যিক মহাকাব্য। হোমার, ট্যাসো, দান্তে, মিল্টনের কাব্যদর্শের সঙ্গে কালিদাস, মাঘ, ভারবি তাঁর কাব্যাদর্শকে প্রভাবিত ও উদ্বেজিত করেছে। গ্রিক মহাকাব্যে অলংকার প্রয়োগ বিশেষতঃ উপমার ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। হোমার অ্যাকিলিস, হেক্টর-এর সুমাহন ব্যক্তিত্ব এবং বিশালতার অনুভব ফুটিয়ে তুলতে একাধিক উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। হোমারের উপমাগৌরব সুপ্রসিদ্ধ যার পরিচয় "হোমোরিক সিমিলি"। এই উপমাগুলি দীর্ঘ যার মধ্য দিয়ে মহাকাব্যিক বিশালতা ও বিস্তৃতির ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। মেঘনাদবধে এর প্রয়োগ প্রাচুর্য আছে।

মধুসূদনের 'মহাগীত' যে 'মধুচক্র' রচনা করেছে তার মধু পান করে 'গৌড়জন' পরিতৃপ্ত ও আনন্দ অনুভব করেছেন। এ কাব্যের ধ্বন্যুক্তি, অনুপ্রাস প্রভৃতি ধ্বনি প্রধান অলঙ্কার প্রায় প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যায়। 'অসির ঝনঝনি', কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা', নীরব রবার, বীণা, সুরজ, মুরলী' ও কমলালয়ে, কমল-আসনে/বসেন কমলাজয়ী (১ম সর্গ, অনুপ্রাস) সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর, স্মরিলা শঙ্করে (ষষ্ঠ সর্গ) বা লঙ্কার পঙ্কজ রবি কেলা অস্তাচলে/(ষষ্ঠ সর্গ) প্রভৃতি বৃত্তানুপ্রাস-এর ব্যবহার কাব্যে অসাধারণ ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করেছে।

শব্দালংকারের থেকে অর্থালংকার গঠনে কবির ব্যক্তিমন অধিকতর ক্রিয়াশীল হওয়ায়, কাব্যের রূপকল্পসৃষ্টিতে কবি মানসের সুস্পষ্ট ছাড়া পড়েছে। অলংকার প্রয়োগে বিশেষত 'হোমোরিক সিমিলি' বা মহাকাব্যিক উপমা ব্যবহারে মধুসূদন বাংলা কাব্যে অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। লঙ্কার পরিচয় দিতে 'কাঞ্চন-সৌধ কিরীটিনী' বা 'হীরাচূড় শিব দেবগৃহ' প্রভৃতি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তাঁর 'উপমা' অলংকারে ব্যবহারে ব্রজ, বিজয়া প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন ঃ

মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিলা/শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিলা যেমতি/

ব্রজে ব্রজকুল শিশু যবে শ্যামমণি/আঁধারি যে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে।" (ষষ্ঠ সর্গ)

বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে সদাজাগ্রত চেতনা উপমা হিসেবে তাঁর কাব্য জগতেও নানা ভাবে ও রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, "তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি পাখী।" (চিত্রাঙ্গাদার উক্তি—১ম সর্গ), নিদাঘে যেমতি/ফলশূন্য বনস্থলী, জনশূন্য নদী/, বরজে সজারু পশি বারুইর যথা ছিন্ন ভিন্ন করে তারে' (১ম সর্গ)—প্রভৃতিতে উপমা ব্যবহারে কবির প্রকৃতি প্রীতি ও স্বদেশানুরাগ প্রকাশ হয়েছে। প্রথম সর্গের 'শোকেরক ঝড় বহিল সভাতে।' বা ষষ্ঠ সর্গের—'কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে প্রাণাধিক—রূপক অলংকারের যেমন, তেমনি 'কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে, পঙ্কিল ?' কাকু বক্রোক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অনুশীলনী—৪

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৬১ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) মহাকাব্যে থাকে _____ বিশালতা ও _____। ফলে মহাকাব্যের _____ একটি অসামান্য _____, _____ একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকে।

খ) বীর রসপ্রধান _____ প্রয়োজনে ইংরেজি _____ _____ এর ছন্দোরীতি বাংলার _____ পয়ারের (মিশ্রবৃত্তের) _____ পুরে মিলহীন _____ _____ বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেন।

গ) হোমার _____ _____ এর _____ ব্যক্তিত্ব এবং _____ অনুভব ফুটিয়ে তুলতে একাধিক _____ আশ্রয় নিয়েছেন। হোমারের _____ সুপ্রসিদ্ধ, যার পরিচয় _____ _____।

ঘ) মধুসূদনের _____ যে _____ রচনা করেছে, তার _____ পান করে _____ _____ ও আনন্দ অনুভব করেছেন।

২) প্রতিটি অলংকারের দুটি করে উদাহরণ দিন ঃ ধ্বন্যুক্তি, বৃত্তানুপ্রাস, রূপক।

৩) মধুসূদন উপমাঋদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে বর্ণনায় সমৃদ্ধি এনেছেন। তিনটি উদাহরণ দিন।

৪) মধুসূদন ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টির জন্য যুক্তব্যঞ্জন ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। পাঁচটি উদাহরণ দিন।

৫) প্রবোধচন্দ্র সেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ না বলে বলেন প্রবহমান পয়ার ছন্দ। এ সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্রের যুক্তিটি বুঝিয়ে দিন।

৬) পয়ার ও মহাপয়ারের মধ্যে পার্থক্যটি ৫টি বাক্যে আলোচনা করুন।

৭) অমিল ও সমিল প্রবহমান বলতে কী বোঝেন। এ দুটির বৈশিষ্ট্য ৫টি বাক্যে ব্যাখ্যা করুন।

৪৮.১২ সংক্ষিপ্তসার

মধুসূদন দত্ত যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা রাজনারায়ণ, মা জাহ্নবী। সেখানে শৈশব অতিবাহিত করে, কৈশোরে কলকাতায় হিন্দু ও বিশপস্ কলেজে লেখাপড়া শেখেন। এ সময় থেকেই কাব্য রচনায় হাতেখড়ি। বিলাত যাওয়ার একান্ত আগ্রহ ও বাবা মার ঠিক করে দেওয়া বিয়ে এড়াতে আকস্মিকভাবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা ও সাংবিদিকাত সূত্রে মাদ্রাজ যান, সেখানেই ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী রেবেকা ম্যাক্টাভিসকে বিয়ে করেন। পরে হেনরিয়েটাকে বিয়ে করেন। ১৮৫৬ তে কলকাতা ফিরে কলকাতায় পুলিশ কোর্টে চাকরি নেন। ১৮৬২ তে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলাত যান, পাশ করে ফেরেন ১৮৬৭-তে। সাহিত্য রচনা শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), বীরাঙ্গানা (১৮৬২)। বিলাতে থাকাকালে চতুর্দশপদী কবিতাবলী, শেষে হেক্টর বধ ও মায়াকানন ছাড়াও কিছু অসম্পূর্ণ রচনা আছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গ এই এককের মূল পাঠ বিষয়। লক্ষ্মণ কর্তৃক দৈবাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে বধ এই কাব্যের যে প্রধান উপজীব্য, তা-ই এ সর্গের বিষয়বস্তু। বীরবাহুর মৃত্যু ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্য গ্রহণ, স্বর্গে দেবতাদের চক্রান্ত, মহাদেবের আনুকূল্য আদায়, মায়া প্রভাবে দৈবাস্ত্র নিয়ে রামচন্দ্রের শিবিরে পৌঁছে দেওয়ার পর লক্ষ্মণ কর্তৃক কাপুরুষের মত নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ হত্যা, এ সব দেবতাদের মায়ায় সম্ভব হয়েছে। মধ্যে তৃতীয় সর্গে প্রমীলা-ইন্দ্রজিৎ প্রসঙ্গের অবতারণা করে ইন্দ্রজিতের প্রতি মানবিক মহিমা আরোপ করে তাঁর মৃত্যুকে অধিকতর ট্র্যাজিক করা হয়েছে। চতুর্থ সর্গ সীতার মুখ দিয়ে পূর্ববর্তী ঘটনা-বিবৃতির মধ্য দিয়ে রাবণের

তথা রাক্ষসকুলের বিপর্যয়কে প্রাক্তনের রূপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম থেকে ষষ্ঠ সর্গ তাই এ কাব্যের শীর্ষ, তার পরে তিনটি সর্গের সাহায্যে কাব্যের পরিণতি টানা হয়েছে।

এই সর্গটি পাঠের জন্যই মহাকাব্যের স্বরূপ ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা নিয়ে সর্গটির মধ্যে মহাকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের যে সাধারণ পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করা হয়েছে। মহাকাব্যের উপস্থাপনায় বস্তুনিষ্ঠা ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য কিছু অলৌকিকত্ব আনা হয়—ষষ্ঠ সর্গের পরিকল্পনায় তা আছে। বিশেষত মেঘনাদনিধনের পূর্বমুহূর্তে এমন দৃশ্যের অবতারণা অন্যতম। মেঘনাদবধ যেহেতু এ সর্গের প্রধান বিষয়, তাই সর্গের নামকরণ করা হয়েছে 'বধঃ'। মহাকাব্যের বৈচিত্র্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধানতঃ দুধরনের যথা যুগসঞ্চিত কাহিনীকে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের প্রেরণায় সাহিত্যিক প্রয়াসে রচিত 'সাহিত্যিক মহাকাব্য' তৎসহ লঘু বিষয় নিয়ে বিদ্রুপাত্মক ব্যঙ্গ মহাকাব্য রচনা করা হয়েছে। মধুসূদনের সাহিত্য প্রয়াস জাত মেঘনাদবধ কাব্যের আদর্শে হেমচন্দ্র বৃত্রসংহার, নবীনচন্দ্র রৈবতক-কুরুক্ষেত্র প্রভাস-ত্রয়ী মহাকাব্য রচনা করেন। শেষে দুজনসহ পরবর্তী মহাকাব্য রচনাপ্রয়াস মধুসূদনের কাব্যকে অতিক্রম করতে পারেনি।

মেঘনাদবধে কবির সহানুভূতি রাম লক্ষ্মণের পরিবর্তে রাবণ-মেঘনাদের ওপরই সমধিক। হোমার-ভার্জিলের কাব্য ও তামিল কম্বন রামায়ণের এ ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব আছে। এ ছাড়াও কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র ও চিত্রকল্প ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগে মিল্টন, শেলি, কালিদাস মাঘ-ভারবি ভবভূতির প্রভাব ইতস্তত আছে। এ কাব্যের অঙ্গীরস বীর হলেও অন্তঃসলিলা করুণরসের প্রস্রবন আছে। অবশ্য এ সম্পর্কে অন্যমতও আছে। ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদ বধ হলেও দেবতাদের চক্রান্ত, লক্ষ্মণের কাপুরষতাকে ছাপিয়ে উঠেছে মেঘনাদের অসম সাহসিকতা ও প্রত্যক্ষকে বীরত্বের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার পরিচয়ে।

পাশ্চাত্য মতে মেঘনাদবধের রসপরিণতি ট্র্যাজিক। মেঘনাদ-এর বধ মানবিক বেদনায় ঋদ্ধ। একটি বীরের অন্যায় মৃত্যু শোকের কারুণ্য সৃষ্টি করেছে। শোকবিদ্ধ রাবণ দেখেছেন 'একে একে নিভিছে দেউটি'। উপলব্ধি করেছেন লঙ্কার অনিবার্য ধ্বংস। রাবণের এই অসহায় বেদনা ব্যক্তি হৃদয়ের হাহাকার-ই ট্র্যাজেডির রসপরিণতি। মেঘনাদের মৃত্যু সেই পরপরিণতিকে রঞ্জিত করেছে।

নিয়তিবাদ এ কাব্যের অন্যতম উপাদান। রাবণ বলেছেন 'বিধি বাম' রাজলক্ষ্মী বলেছেন, 'প্রাক্তনের ফল'। কিন্তু মেঘনাদের অন্যায়ভাবে অপ্রত্যাশিত মৃত্যু, অন্ধ নিয়তি নির্মমতা ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না।

মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন রাম-লক্ষ্মণের পরিবর্তে রাবণ-মেঘনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। শেষোক্তদেরই তিনি এ কাব্যের প্রধান আকর্ষণস্থল করেছেন। রামচন্দ্রের অনেক মহত্ব থাকা সত্ত্বেও মেঘনাদের প্রতি আত্যন্তিক মমতাবশত কালিমালিপ্ত করেছেন। অনুরূপে লক্ষ্মণের অপরিমেয় সাহস চরিত্রবল, ধৈর্য, সংযম, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ থাকা সত্ত্বেও দৈবাস্ত্রে শক্তিশালী হয়েও কাপুরুষের মতো মেঘনাদকে বধ করেছে। বীরধর্মের শুধু নয়, মনুষ্যধর্মের অবমাননা, মেঘনাদের বীরগৌরবকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মেঘনাদ মধুসূদনের Favourite Indrajit লক্ষ্মণের কাপুরুষোচিত আচরণের জন্যই ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কার পঙ্কজরবি আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

বিভীষণ শুধুমাত্র দেশদ্রোহী নয়, তারও যে একটি দুর্বল হৃদয় আছে সেটি ফুটেছে মেঘনাদের মৃত্যুর পর তার বিলাপে। বিভীষণের বিলাপ একটি স্নেহরসসিক্ত হৃদয়ের বিলাপ।

এ কাব্যের দেবদেবীর ঈর্ষাদ্বেষপরায়ণ। মেঘনাদবধ ও রাবণকে তিলে তিলে ধ্বংস করার জন্য হীন কুচক্রী মানুষের মত কোনো চক্রান্তকেই বাদ দেননি। তাঁরা দৈবাস্ত্র সরবরাহ করেই ক্ষান্ত হননি। মায়ার সাহায্যে সবার চোখের আঁড়ালে, প্রতিপক্ষের শক্তিহরণ করে, অস্ত্রাঘাতে জর্জনিরত করে নিহত হয়েছে। কামনা-বাসনা-ঈর্ষা-ক্রোধ নিয়ে দেবতা ও মানুষ এখানে একাকার হয়ে গেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা মহাকাব্যের ভাবরস ফুটিয়ে তোলার জন্য গুরুগম্ভীর তৎসম, যুক্ত ব্যঞ্জন, ধ্বনি সৌসম্যের জন্য অলঙ্কৃত। ছন্দ গতিশীল, প্রবহমান পয়ার অলংকার উপমার বাহুল্য ধ্বন্যুক্তি অনুপ্রাসের সঙ্গে উপমা হোমোরীয় উপমা রূপক প্রভৃতি শব্দালংকার ও অর্থালংকারে সমৃদ্ধ।

৪৮.১৩ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। ক) কালাগ্নি, দাবাগ্নি, বনরাজি, বায়ুসখা।

খ) বিভীষণ, বিভীষণ, পুষ্প, মঙ্গালবাজনা, অপ্সরা, জয়রবে।

গ) ২৫ জানুয়ারি, জুন ১৮৭৩।

ঘ) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রেবেকা, আত্মনিবেদন, হেনরিয়েটা।

ঙ) ১৮৬০, 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী'।

২। ক) ১৮৪৩, খ) ১৮৬২, গ) বিশপস্ কলেজ, ঘ) মায়াকানন।

৩। মহাসর্প, খাপে, সিক্ত করিল, মেঘাচ্ছন্ন, অগ্নি, অগ্নি, চয়ন করিয়া (তুলিয়া), সাপ, কর্কশ, সেনা, অলংকার, ধনুক।

৪। বাদিএ ____ বাজনা, কাদম্বিনী ____ মেঘমালা, স্কন্দ ____ কার্তিকেয়, দিবিন্দ্র ____ দেবরাজ ইন্দ্র, নক্র ____ কুমীর, আনায় ____ জাল, আহবে ____ সংগ্রামে, যুদ্ধে ; জীমুতেন্দ্র ____ মেঘরাজ ; আসার ____ বৃষ্টি, শব্দবাহক ____ আকাশ।

৫। ক) ৪৮.৬ অংশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অংশটি দেখুন।

খ) বিরূপাক্ষ, তালজঙ্ঘা, কালনেমি, প্রমত্ত, চিক্ষুর।

গ) ঘ), ঙ) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী—২

১। ক) রাজা, বাদশাহদের, সংস্কৃতে, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ।

খ) বস্তুনিষ্ঠা, চমৎকারিত্ব, সৃষ্টির, অলৌকিকত্ব, কাব্যসম্মত।

গ) সচেতন, শিল্পীর তীক্ষ্ণ, সুনির্দিষ্ট প্রভাব।

ঘ) রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসির, কল্পনাকে, স্নিগ্ধতার, ইলিয়াডের, শৌর্যের।

২। ক) রামায়ণ, মহাভারত/ইলিয়াড, ওডিসি, মেঘনাদবধ কাব্য, বৃত্রসংহার/কুমারসম্ভব, রঘুবংশ/ ইনিড, জেরুজালেম উদ্ধার, ছুছুন্দরীবধ কাব্য, ভেকমূষিক যুদ্ধ / রেপ অফ দি লক।

খ) নবীনচন্দ্র সেন, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস।

গ) রৈবতক-এ সূত্রপাত, কুরুক্ষেত্র-তে জটিলতা ও বিস্তার, প্রভাসে-পরিণতি।

৩। ক) বাঙালির রামায়ণী সংস্কার অনুসরণে রচনা।

খ) ১৮৭৫, গ) পোপ, ঘ) রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪-৭ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর করতে বর্তমান দুটি পাঠ একাধিকবার পড়ুন।

অনুশীলনী—৩

১। ক) ইন্দ্রজিৎ, নিধন, তাৎপর্যমণ্ডিত, মেঘনাদবধে।

খ) যজ্ঞাগার, বটবৃক্ষতল, কৃত্তিবাস, ঐন্দ্রাস্ত্রে।

গ) ভারতীয়, পাশ্চাত্য, অনুকরণে, গতিশীলতা।

ঘ) বীর, করুণ, সম্মিলন।

ঙ) বীরবাহুর, পিতা রাবণ, রাজা রাবণ, মনস্তাপে।

২। ক) বাল্মীকির প্রভাব আছে ; খ) ধ্বংসোন্মুখ চিত্রবিশেষ।

গ) মেঘনাদবধ কাব্য, ঘ) মেঘনাদ

৩-৭ উত্তর সংকেত অপ্রয়োজনীয়।

৪৮.১১ এবং ৪৮.১২ মূলপাঠ অংশগুলি বারবার পড়ুন।

অনুশীলনী—৪

১। ক) ওজস্বিতা, বিস্তৃতি, কল্পনায়, সমুন্নতি, ভাষায়।

খ) কাব্যভাষার, Blank verse, চতুর্দ্দশাক্ষর, কাঠামোয়, প্রবহমান পয়ার।

গ) অ্যাকিলিস, হেক্টর, সুমহান, বিশালতার, উপমার, উপমাগৌরব, হোমারিক, সিমিলি।

ঘ) মহাগীত, মধুচক্র, মধুপান, গৌড়জন, পরিতৃপ্ত।

২-৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য এককেরক বর্তমান মূলপাঠটি একাধিকবার পড়ুন—তাহলে উত্তর করা সহজ হবে।

৪৮.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ সেন (সম্পা)—মেঘনাদবধ কাব্য।

২) অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী (সম্পা)—মেঘনাদবধ কাব্য।

৩) ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্র—মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ জীবন ও সাহিত্য।

৪) ড. ক্ষেত্র গুপ্ত—মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প।

৫) ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়—আধুনিক বাংলা কাব্য (১ম পর্ব)।

৬) ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—কাব্যতত্ত্ব বিচার।

৭) ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু—বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ।